আব্বাস কিয়ারোস্তামিঃ নতুন সিনেমায় ফেরা

মাহমুদুল হোসেন

হাঙ্গেরির ওতোর চলচ্চিত্রনির্মাতা বেলা টার আন্দ্রেই তারকোভস্কির সাথে নিজের কাজের তুলনাকে বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন, "He's much more innocent than us—than me. No, we have seen too many things to make his kind of film. I think his style is also different because several times I have had a feeling he is much softer, much nicer."[1]। সেটা ২০০৪ সালের কথা। তারকোভস্কির চেয়ে অনেক বেশি দেখেছেন বলছিলেন বেলা টার। এই দেখার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে বার্লিন দেয়ালের পতন, আদর্শহীন এক সময়ের মধ্যে মানবতার অনিশ্চিত যাত্রা, পণ্যময় আকণ্ঠ ভোগের ডিপ্রেশন, বেপরোয়া প্রযুক্তি বিভ্রম এবং ভায়োলেন্স–বিপ্লবের দোহাই-এ। হায় বিপ্লব! তাই বেলা টার এবং তাঁর মতো আরো অনেকে এই নতুন শতকে ঊষর, বিষন্ন, নেতি-প্রাণ, বর্ণহীন, অবিশ্বাসী শিল্পের রচয়িতা। কেননা, এখন জীবনের ভেতরটা যেন এমনই।

অথচ এই কালেই আব্বাস কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র বিষয়ীগতভাবে সদর্থক, মৃদু, সংকেতময়, গভীর সংবেদী, চিত্রল।অথবা শুধু এই কেন–বাস্তবতাবিষয়ক নতুন নতুন প্রস্তাবনা, কাব্য এবং চিত্রকলার ঐতিহ্যের মধ্যে সমকালের সত্যের উদযাপন, জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে নৈতিক প্রশ্নসমূহের বিবেচনা অথবা প্রচলিত নৈতিকতা বিষয়ে পরিহাসপ্রবণ অনাস্থা–বিশদে বললে এসবই তাঁর চলচ্চিত্র। ক্রমশ মৃত সময়ের পারদর্শী কারিগর হয়ে উঠেছিলেন, দর্শককে জিজ্ঞাসু, সক্রিয় করে তুলেছিলেন এই কৌশলে। আমাদের তো মনে আছে *ক্লোজ আপ*-এর গোড়ার দিকেই সেই দীর্ঘ দৃশ্যটির কথা। দৃশ্যের শেষভাগে সাবজিয়ানকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন ক্যামেরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ না করে বাইরে অপেক্ষা করে। আমরা, দর্শকেরা, ট্যাক্সিচালকের সাথে বাইরে অপেক্ষা করি। আমরা তার সাথে বাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, আকাশে বোমারু বিমানের উড়ে যাওয়া আর তার ধোঁয়ার পথরেখা দেখি, ট্যাক্সিচালকের সাথে মরা পাতা আর ফুলের স্তূপের ভেতর থেকে ফুল কুড়াই; দেখি একটি টিনের ক্যানে সে লাথি মারছে, ক্যানটির গড়িয়ে চলা দেখতেই থাকি। এই তুচ্ছ, অর্থহীনতার মধ্যে আমরা আটকে থাকি; আসল ঘটনা বাড়ির ভেতরে ঘটতে থাকে। আমরা, দর্শকেরা জিজ্ঞাসু, সক্রিয় এমনকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি।

মৃত সময়ের এই চলন ডিজিটাল সিনেমায় আরো বিদগ্ধ হয়ে উঠেছে; *টেন* অথবা *শিরিন* দাবি করছে দর্শকের সংবেদী সক্রিয়তা; সৃষ্টি করছে চলচ্চিত্র অনুধাবনের নতুন নতুন মাত্রা।

আর *শিরিন*-এর কথা যখন উঠলই, এখনই, তখন বলে নেওয়া যাক তাঁর শব্দ-ছবির কথা। বলেন কিয়ারোস্তামি, দারুণ আস্থায়, "I regard sound as being very important, more essential than pictures. A two-dimensional flat image is all you can achieve with your camera, whatever you may do. It's the sound that gives depth as the third dimension to that image. Sound, in fact, makes up for the shortcoming of pictures."[2]

শব্দ-ছবির এই নিরীক্ষা *টেন*, *ফাইভ লং টেকস ডেডিকেটেড টু ওজু* এইসব ডিজিটাল ছবিতে। তার চূড়ান্ত, দুঃসাহসী অভিব্যক্তি *শিরিন*-এ। তাহলে কিয়ারোস্তামি কি এক আত্মমগ্ন, বিবরমুখী শিল্প-স্রষ্টা? তাঁর সমকালের নিষ্করুণতা কি তাকে বিচলিত করে না? তিনি কি নির্বিকার এবং নত? প্রতিষ্ঠানের সাথে অবিরোধী তাঁর শিল্প-যাত্রা? *টেন* এবং পরবর্তী ছবিগুলির কথা না হয় পরের জন্যেই তোলা থাক; কিন্তু যে *ক্লোজ আপ*,*থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ*,*টেস্ট অব চেরি* বা *দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস* তাঁকে দিয়েছিল জগৎ-জোড়া খ্যাতি এমন এক চলচ্চিত্রকার হিসেবে যিনি দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এক চলচ্চিত্রের রূপকার বেলা টারের এই কথিত কঠিন কালে সেইসব ছবিতেই এক নিহিলিস্ট শিল্পীর সাথে জড়িয়ে পড়ি না কি আমরা? এমন এক শিল্পী যিনি শিল্পভোক্তার দায়মুক্তির দায়িত্ব নেন না। *ক্লোজ আপ* দর্শককে সত্যবিষয়ক এক জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করে, *থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ* এই নিশ্চয়তা দেয় না যে হোসেন এবং

[1]http://www.kinoeye.org/04/02/ballard02.php

[2]http://sensesofcinema.com/2006/book-reviews/cinema_kiarostami/

তাহেরেহ্ এক নতুন সুন্দর জীবন শুরু করতে পারবে। যেমন নিশ্চয়তা দেয় না *দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস* যে বেহজাদ ওই শুদ্ধ গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতায় একজন খাঁটি হিউম্যানিস্ট হয়ে উঠবে। আর *টেস্ট অব চেরি* তো বেঁচে থাকার অর্থ এবং যৌক্তিকতাকেই ক্লিন-চিট দেয় না! এভাবে এক মৃদুস্বর অ্যানার্কি, ব্যর্থ মানবতা অথবা রাজনীতি বিষয়ে ক্ল্যান্ডেস্টাইন ম্যানিফেস্টো। কিয়ারোস্তামি বলেছেন যে বাস্তবতার ভেতর তিনি সৃষ্টি করে যাচ্ছেন সেখানে তাঁর ছবিকে তিনি, "a tale of social injustice, frustration, forbiddance and stifling tradition"[3]হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন না। তাই সদর্থক পরিণতির এক ইঙ্গিত প্রায় সব ছবির শেষেই; কিন্তু শেষটাই পুরো ছবি নয়। বলা যায়, কিয়ারোস্তামির বহু স্তরের ন্যারেটিভের প্রতি অবিচার হবে তাঁর ছবির পরিণতিকে ছবির মর্ম হিসেবে গ্রহণ করলে।

আলোচকরা এই বলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যে, "He was one of the greatest ironists and symbolists in the history of cinema, bringing out grand philosophical ideas and depicting independent-minded characters, nothetheless apparently deferring to imposed conventions and expectations."[4]।

আসলে আব্বাস কিয়ারোস্তামি নতুন সিনেমার কারিগর। আপাত ন্যাচারালিজমের ভেতওে তাঁর চলচ্চিত্র আঙ্গিকের নিরীক্ষায়, দার্শনিক গভীরতায়, নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনে আশ্চর্য কৌশলী। তাঁর চলচ্চিত্রে কাহিনি এবং প্রামাণ্যকরণের যে কূটাভাষ তা আসলে জীবন ও বাস্তবতা বিষয়ে এক দার্শনিক সংলাপ। তাঁর এক চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যে একজন অভিনেতা দর্শককে সরাসরি জানান যে, তিনি এই ছবিতে একজন চলচ্চিত্র-পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তিনি আরো জানান যে, এই চলচ্চিত্র পরিচালক তার ছবির জন্যে একজন অভিনেত্রীকে বাছাই করার জন্যে এই গ্রামে এসেছেন। এইভাবে বাস্তব এবং গল্পের সীমানাটা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, অথবা বাস্তব এবং গল্পের খোলসগুলোকে আমরা ক্রমাগত ছাড়াতে থাকি, কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্রে, সত্যে পৌঁছনোর সংগ্রামে। আবার স্বপ্নও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কাছে, ওই সত্যে পৌঁছনোর হাতিয়ার হিসেবেই।

অথবা কিয়ারোস্তামি যেভাবে তাঁর ছবির দৃশ্যমানতাকে সম্পৃক্ত করেছেন পারস্যের প্রাচীন চিত্রকলার আঙ্গিকের সাথে সে কথাই বলি না কেন? পারস্যের প্রাচীন চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতি, উল্লম্ব কম্পোজিশন,উপস্থাপিত দৃশ্যের কোনো কেন্দ্রীয় ফোকাল পয়েন্টের অনুপস্থিতি এসব বিষয় তাঁর প্রধান প্রধান ইমেজ-মোটিভগুলো নির্মাণ করেছে। কিয়ারোস্তামির সকল ছবি নিয়ে আলোচনা এরকম একটি সেমিনারে সম্ভব নয়। আমরা সেজন্যে স্থির করেছি যে তাঁর প্রথম চারটি ডিজিটাল কাজ নিয়ে আমরা আজকের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব।

ডিজিটালপ্রামাণ্যকরণের নিরীক্ষা: *এ বি সি আফ্রিকা* (২০০১)

নতুন শতকে আব্বাস কিয়ারোস্তামি তাঁর চলচ্চিত্র-অভিব্যক্তির নবায়ন করলেন; নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে।

এ বি সি আফ্রিকা উগান্ডার শিশুদের ওপর নির্মিত কিয়ারোস্তামির প্রামাণ্যচিত্র। জাতিসংঘের কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাড) কিয়ারোস্তামিকে এই ছবিটি কমিশন করে। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ এবং এইডস-এর মহামারীর মধ্যে একটি বেসরকারি সংস্থা কীভাবে উগান্ডার শিশুদের রক্ষার চেষ্টা করছে সে বিষয়ে একটি প্রচারণামূলক ছবি করা। কিয়ারোস্তামি ও তাঁর সহকারি সাইফোল্লাহ সামাদিয়ান এ বিষয়ে একটি প্রাথমিক জরিপ করার জন্যে দশ দিনের সফরে উগান্ডা যান। তাঁদের কাছে ছিল দুটি ডিজিটাল হ্যান্ডিক্যাম। সফরের সময় তাঁরা এই ক্যামেরাগুলি দিয়ে প্রচুর ছবি তুলেছিলেন যা এক ধরনের ট্র্যাভেল নোট হিসেবে ব্যবহৃত হবে–এই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা ছিল এরপর তাঁরা আবার উগান্ডায় যাবেন ছবিটি শুট করার জন্যে। কিন্তু প্রাথমিক সফর শেষে ফিরে এসে এই ট্র্যাভেল নোটগুলো দেখে কিয়ারোস্তামির মনে হলো মূল ছবিটি করার উপাদান তিনি পেয়ে গেছেন। প্রায় বিশ ঘণ্টার যে চলচ্ছবি তাঁরা রেকর্ড করে এনেছিলেন, প্রায় অপরিকল্পিতভাবেই তা-ই আট মাস ধরে সম্পাদনা করে তাঁরা নির্মাণ করলেন *এ বি সি আফ্রিকা*। এই ছবির মাধ্যমে আব্বাস কিয়ারোস্তামির ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু। অন্তত পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র অর্থে তো বটেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শোনা যাক।

[3] http://sensesofcinema.com/2006/book-reviews/cinema_kiarostami/

[4] Richard Brody, Postscript: Abbas Kiarostami, 1940-2016, http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/

"I felt that a 35mm camera would limit both us and the people there, whereas the video camera displayed truth from every angle, and not a forged truth. To me this camera was a discovery. Like a God it was all encompassing, omnipresent. The camera could turn 360 degrees and thus reported the truth, an absolute truth."[5]

এ বি সি আফ্রিকা দেখে কিয়ারোস্তামির এই বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় কি না সে এক বিতর্ক বটে। কারণ ডিজিটাল হ্যান্ডিক্যামের সর্বত্রগামিতা এবং ৩৬০ ডিগ্রী বাস্তবতার উন্মোচন উত্তেজনাকর বটে; কিন্তু "জাল সত্য" এবং "পরম সত্য" প্রসঙ্গটি এত সরল নয় সম্ভবত। এই ছবিতেই কিয়ারোস্তামি যে ইমেজ ধারণ করেছেন তা "seems to subvert distinctions between fact and fiction, truth and artifice, the real and the fake"[6]।

অন্তত এটা তো বলা যাবেই যে, কিয়ারোস্তামির উপস্থিতি এবং তাঁর ডিজিটাল ক্যামেরা উগান্ডার গ্রামের জীবনের সত্যকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাব হয়তো ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরার মতো কর্তৃত্ববাদী নয়, বরং অংশগ্রহণমূলক। আর হয়তো পূর্ণাঙ্গ সত্যকে এভাবে দেখা যেতে পারে যে, এটি যা আমরা দেখছি সেটি যে একটি প্রামাণ্যচিত্র; অলৌকিক কোনো অদৃশ্য চোখের দৃষ্টিক্ষেপ নয় তা এ বি সি আফ্রিকায় প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত। ছবিতে আমরা কেবল কিয়ারোস্তামিকে ভিডিও শুট করতে দেখি না, বরং এভাবেও দেখি যে, তাঁর সহকারি সামাদিয়ান কিয়ারোস্তামির শুট করার দৃশ্য শুট করছেন। তাদের হ্যান্ডিক্যাম হয়তো ক্রমশ গ্রামের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে; শিশুরা, গ্রামবাসী, হাসপাতালের নার্স, ইফাডের কর্মী, শিশুদত্তক নিতে আসা অস্ট্রিয়ার দম্পতি, হোটেলের কর্মচারিরা, গাড়ির চালক সকলে এই ছোট্ট ক্যামেরাগুলিকে এবং তাদের সামনে পারফর্ম করাকে জীবনযাপনের আরেক আবশ্যিকতা হিসেবে গ্রহণ করে। কেন করে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ডিজিটাল এই সময়ে ইমেজ নির্মাণকে মানব সমাজ এক নৃতাত্ত্বিক রিচুয়াল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই রিচুয়াল জীবন যাপনের সমান্তরালে চলতে থাকা এক প্রক্রিয়া, যার দাবি হয়তো কিছু বাড়তি পারফরম্যান্সের।

কিন্তু সকল রিচুয়ালই তো এমন দাবি রাখে।এভাবে নতুন সত্য নির্মিত হয়, ডিজিটাল সত্য। এই প্রশ্ন করাই যায় যে, প্রামাণ্যচিত্রকারকে কি অবধারিতভাবেই ঘটনার অংশ হয়ে উঠতে হয়, এবং এই কি তাহলে সত্য যে, তিনি আসলে এই নতুন সত্যকেই ধারণ করেন; জীবন যেভাবে চলছিল ক্যামেরা এবং প্রামাণ্যচিত্রকারের আবির্ভাবের আগে তাকে আসলে ধারণ করার কোনো সম্ভাব্য উপায় নেই? *এ বি সি আফ্রিকা* এই পুরাতন প্রশ্নকে নতুন করে সামনে আনে। আর সেই সাথে ডিজিটাল সত্যের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ধারণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

টেন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত তাঁর প্রথম কাহিনি-চিত্র। বিশাল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ধীর গতির প্যানের যে মহাকাব্য তাঁর ছবির মূল চিত্রময়তা তার বদলে গাড়ির ড্যাসবোর্ডে বসানো ডিজিটাল ক্যামেরার আঁটো শট। বড়ো জোর গাড়ির সহযাত্রীর দৃষ্টিকোণে ধরা উলম্ব টাইট শট। *টেন* আব্বাস কিয়োরোস্তামির "ডিজিটাল মাইক্রো-সিনেমা"র এক নিরীক্ষা। অল্প চরিত্র, ন্যূনতম আয়োজন, আপাত অপরিকল্পিত সংলাপের প্রবাহ, প্রায় অনুপস্থিত দৃশ্যধারণ, সীমিত সম্পাদনা–এসবই টেন ছবির বৈশিষ্ট্য। আর যা ঘটেছে তা হলো এই ডিজিটাল নির্মিতির কৌশল এমন এক সিনেমাটিক স্পেসের জন্ম দিয়েছে যা ৩৫ মিলিমিটার চলচ্চিত্রের জীবনচক্রে অসম্ভব ছিল। সত্যিকার অর্থে কর্তৃপক্ষকে কিয়ারোস্তামি যে স্ক্রিপ্টটি জমা দিয়েছিলেন এবং নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে *টেন* নামের যে ছবিটি তিনি শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন তারা পুরোপুরি ভিন্ন।

ত্রিশোর্ধ একজন নারী। তিনি বছর দশেকের এক ছেলের মা। ডিভোর্সী এবং পুনরায় বিবাহিত। কর্মজীবী। এই তার প্রোফাইল। তেহরানের রাস্তায় তিনি গাড়ি চালান ছবির দশটি দৃশ্যেই। তার সহযাত্রী কখনও তার সন্তান, কখনও বোন, কখনও অপরিচিত এক দেহজীবী নারী অথবা অন্য এক তরুণী। দৃশ্যগুলিতে ভালোবাসা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ধর্ম, প্রার্থনা, বিশ্বাস, মাতৃত্ব, দেহজীবিকা, পারিবারিক মূল্যবোধ এসব বিষয় উপস্থাপিত হয়। প্রতিটি দৃশ্য শুরু হয় ফিল্ম লিডার দিয়ে। প্রথম দৃশ্য দশ, পরেরটি নয়, এভাবে উল্টো দিকে গুণে এক-এ যেয়ে তার শেষ। দশটি দৃশ্য পৃথক এবং আলাদা আলাদা অনু-সিনেমার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা জানি

[5] http://sensesofcinema.com/2013/feature-articles/the-appearance-of-appearance-absolute-truth-in-abbas-kiarostamis-abc-africa/

[6] http://sensesofcinema.com/2013/feature-articles/the-appearance-of-appearance-absolute-truth-in-abbas-kiarostamis-abc-africa/

ছবির ন্যারেটিভের মধ্যেই ফিল্ম লিডারকে অন্তর্ভুক্ত করা আভাঁ গার্দ চলচ্চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেকদিন থেকেই স্বাধীন নির্মাতারা চলচ্চিত্রের গল্প-পৃথিবীর বিভ্রমকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখান করতে চেয়ে এই প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন। কিয়ারোস্তামি তাঁর ডিজিটাল নিরীক্ষায় এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

চলচ্চিত্র-আলোচক রোলান্ডো কাপুটো প্রস্তাব করেছেন যে, কিয়ারোস্তামি আসলে দশ থেকে এক পর্যন্ত ফিল্ম লিডার গুণে ছবিটি শেষ করনে নি, বরং শুরু করেছেন। দর্শকের ভেতরে এক নতুন চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হবে এরপর। এভাবে ব্যাপক অর্থে গণতান্ত্রিক অথচ ব্যক্তিগত এক চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

আবার ন্যারেটিভ সিনেমার মধ্যেই যারা কাউন্টার সিনেমার প্রস্তাবনা রেখেছেন তারা বলছেন, "Its function is to struggle against the fantasies, ideologies and aesthetic devices of one cinema with its own antagonistic fantasies, ideologies and aesthetic devices."[7]। *টেন* নতুন চলচ্চিত্রিক নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাবনা রাখে, অথবা বিকল্প চলচ্চিত্র-নন্দনতত্ত্বকে সংহত করে। দশটি দৃশ্য যেমন দশটি অনু-চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তেমনি তারা সকলে মিলে তেহরানের নগরবাসী জীবনের সামগ্রিক এক ট্র্যাজেডির প্রামাণ্যকরণ। চলচ্চিত্রের রাজসিক অথবা এপিক ফর্মালিটির বিপরীতে ডিজিটাল সামান্যতার আঙ্গিক। চিত্রনাট্যের খোলা গঠন, যেখানে কোনো লিখিত সংলাপ নেই, নেই চরিত্রদের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা এক নতুন ফ্যান্টাসির সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত করতে থাকে। আর কিয়ারোস্তামির ফিকশন/ডকুমেন্টারি যোগাযোগ চলতেই থাকে। *টেন* ছবির মূল চরিত্র মানিয়া আকবরি ব্যক্তিগত জীবনে একজন চিত্রশিল্পী, অভিনেতা নন। তিনি ডিভোর্সী এবং এক সন্তানের মা। তার আসল ছেলেআমিনকেই আমরা ছবিতে তার ছেলের চরিত্রে দেখি।

টন ছবিতে দুটি ডিজিটাল দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। দুটিতেই ক্যামেরা স্থির এবং লেন্সের ফোকাল লেন্থও স্থির। আলোচকরা দেখাচ্ছেন এভাবে একধরনের "two-point mise en scene" সৃষ্টি হয়েছে। এই মিজ অঁ সিনে দর্শক অনেক ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে পেরেছেন অথবা এই দৃশ্যায়ন অনেক নিবিষ্টতা দাবি করেছে দর্শকের কাছে। দর্শকের, প্রতিজনের নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং এভাবে নিজস্ব টেন সৃষ্টি করে নেবার জন্যে। ডিজিটাল সিনেমার এই তো অনন্যতা।

"... the potential of digital cinema lies not so much in the narration of 'new' or 'different' stories but in the reconfiguration of existing relationships beween actor, director, spectator."[8]।

টেন ছবির দশটি দৃশ্যের দৈর্ঘ্য সমান নয়। প্রথম দৃশ্যটি (মানিয়া এবং তার ছেলে আমিন) প্রায় আঠারো মিনিট লম্বা। আবার কোনো দৃশ্য দৈর্ঘ্যে ছয় মিনিট মাত্র। একই গাড়ির সামনের দুটি আসনে বসে দুটি করে চরিত্র দৃশ্যগুলিতে কথা বলে। দৃশ্যগুলি ধারণ করা হয়েছে ড্যাশবোর্ডে বসানো ক্যামেরা অথবা দুটি চরিত্রের কোনো একটি দৃষ্টিকোণে বসানো ক্যামেরা থেকে। কিন্তু শট গুলির দৈর্ঘ্যে নানা রকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে আমিনকে একটানা প্রায় সতের মিনিট একই শটে দেখানো হয়েছে। দর্শকরা, মানিয়ার সংলাপ অনবরত শুনে যাচ্ছেন, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এভাবে দর্শকের মধ্যে একটি সক্রিয়তা সৃষ্টি হচ্ছে, মানিয়ার ইমেজ সে কল্পনা করতে চাইছে। আরো পরে শিরিন ছবিতে এই প্রক্রিয়ার বিপ্লবাত্মক পরিণতি দেখতে পাব যেখানে একটি গোটা ছবির ইমেজ নির্মাণের দায়িত্বই দর্শকের সক্রিয় কল্পনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। টেন-এর শট-এর দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গে ফিরে বলা যাক, দ্বিতীয় দৃশ্যটিতেই কিন্তু এত লম্বা কোনো শট নেই। সেখানে মানিয়া এবং তার বোনকেড্যাশবোর্ডে স্থাপিত ক্যামেরা থেকে থেকে ক্রমাগত ক্রস কাটিং করে দেখানো হয়। ছবিতে একবারের বেশি ক্যামেরা গাড়ির বাইরের দৃশ্য বিষয়ে আগ্রহী হয় না। আমরা প্রথম দৃশ্যের শেষে মানিয়াকে দেখি আরেকটি গাড়িকে পার্কিং থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে যাতে সে তার গাড়িটি সেখানে পার্ক করতে পারে। কিন্তু আসলে বিষয়টি দেখি না আমরা, কেবল মানিয়ার সংলাপ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিষয়টি আমাদের অনুধাবনের মধ্যে নির্মিত হয়। গাড়ির বাইরের যে ঘটনায় টেন-এর ক্যামেরা আগ্রহী হয়ে ওঠে সেটি দেহজীবী মহিলাটির গাড়ি থেকে নেমে আরেকটি গাড়িতে চড়ার দৃশ্যাংশ। নগরের রাস্তায় রাতের আলো-আঁধারির রহস্য অথবা বেদনার মধ্যে এ দর্শকের জন্যে এক ভয়ারিস্ট দৃষ্টিক্ষেপ। আবার গাড়ির ব্যক্তিগত স্পেসের নিরাপত্তার ভেতর থেকে অনিশ্চিত, জিঘাংসু নগরকেও দেখা। চার নম্বর দৃশ্যটি যেটি তরুণী মেয়েটির সাথে দ্বিতীয় দৃশ্য, সেখানে চরিত্ররা একে অপরকে স্পর্শ করে। প্রেমিকের প্রত্যাখানে ভেঙে পড়া মেয়েটির

[7]Alex Munt, Digital Kiarostami & The Open Screenplay, http://scan.net.au/scan/journal/display.php?journal id=74

[8]Alex Munt, Digital Kiarostami & The Open Screenplay, http://scan.net.au/scan/journal/display.php?journal id=74

কান্না ভেজা গাল মুছে দেয় মানিয়া। স্পর্শটি মানবিক, সেনসুয়াল। চুল কেটে ফেলা তরুণীর মাথা ঢাকার আবরণটি খুলে ফেলার মধ্যে একটি আশ্চর্য উন্মোচনের ব্যাপার আছে যেন। "অন-স্ক্রিন চরিত্র বনাম অফ স্ক্রিন কণ্ঠস্বর" কিয়ারোস্তমির একটি প্রিয় ফর্মালিটি। *টেন* ছবিতে এই নিরীক্ষা তার ক্লাইমেক্সে পৌঁছেছে। আমরা বলেছি প্রথম দৃশ্যের কথা যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে মানিয়াকে দেখা যায় না, কেবল তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। দেহজীবী নারীটিকেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখি না আমরা। মানিয়ার সাথে তার কথোপকথন চলতে থাকে।

টেন বিষয়ে কিয়ারোস্তামি নির্মাণ করেছিলেন প্রামাণ্যচিত্র *টেন অন টেন*। এখানে কিয়ারোস্তামি একটি ল্যান্ড রোভার ফোর হুইলারে বসে *টেন* ছবির নানা দিক নিয়ে কথা বলেন। এটিও দশ দৃশ্যের ছবি। এখানে অবশ্য দৃশ্যক্রম দশ থেকে এক নয়, এক থেকে দশ। *টেন* নির্মাণের পশ্চাৎপট, ছবির চিত্রনাট্য, ক্যামেরা, লোকেশন, সঙ্গীত, অভিনেতা, পরিচালনা এবং সব শেষে লাস্ট লেসন; এসব বিষয়ে কথা বলেছেন কিয়ারোস্তামি *টেন অন টেন* ছবিতে।

টেন নির্মাণের প্রায় দশ বছর আগে শিল্প-আলোচক ফারাহ নায়েরি কিয়ারোস্তামিকে প্রশ্ন করেছিলেন, "It is possible to make films about women who live in city, who work, who drives cars, as they also exist in reality?"[9] *টেন* নির্মাণের ভেতর দিয়ে কিয়ারোস্তামি এই প্রশ্নটিকেই মোকাবেলা করেছেন।কেউ প্রশ্ন করেছিলেন টেনকে নারীবাদী চলচ্চিত্র বলা যায় কি না। কিয়ারোস্তামির উত্তর, "Feminists are sure of what they believe, and I can go along with them on many points, but I am unable to share their certainities and assurance."[10]

ফাইভ অথবা *ফাইভ লং টেকস ডেডিকেটেড টু ওজু* কিয়ারোস্তামির ২০০৩ সালের ছবি। ডিজিটাল কারিগরি প্রযুক্তিতে নির্মিত এবং প্রদর্শিত এই ছবি প্রকৃতি ও শিল্পবিষয়ক এক নিরীক্ষা এবং একই সাথে জাপানের মহত্তম চলচ্চিত্রকার ইওশোজিরো ওজুর জন্মশতবার্ষিকীতে আব্বাস কিয়ারোস্তামির শ্রদ্ধাঞ্জলি। পাঁচটি স্থির, দীর্ঘ শটে পাঁচটি বিচ্ছিন্ন সিকোয়েন্স। বাস্তবে শেষ সিকোয়েন্সটি সম্ভবত একটি মাত্র শটে গৃহীত নয়; তবে বিষয়টির উপস্থাপনার মধ্যে এই দীর্ঘ এক শটের মুডটি বজায় রাখতে চাওয়া হয়েছে। প্রকৃতির মনুমেন্টালিটি, আলো এবং অন্ধকার, সাদা এবং কালো, শব্দ এবং নিরবতা, দৃশ্য সংবেদ বনাম শব্দ সংবেদ, গতি বনাম স্থিরতা–এভাবে কিছু বোধের অভিজ্ঞতা; এক চলচ্চিত্রিক অনন্যতা। বোধের মধ্যে ওজুর শিল্প-সংবেদও প্রচ্ছন্ন। আছে বিচ্ছিন্নতার থিম। ওজুর হারানোর বেদনা আর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, প্রশান্তি এবং সয়ে নেওয়া–এসব মিলে পাঁচটি দীর্ঘ স্থির টেক।

টেক-১ (১০ মি:): নিকষ কালোর ভেতর থেকে জেগে ওঠা এক মেঘলা দিন। সমুদ্রের প্রবল শব্দ। বেলাভূমির দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকা ঢেউ। একটি পড়ে থাকা কাঠের টুকরা। যেন সমুদ্রের ঢেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। কার কাছ থেকে কে জানে! এই সংগ্রাম চলতে থাকে। একসময় কাঠের টুকরার একটি অংশ সমুদ্রের পানিতে ভেসে যায়। পড়ে থাকে ছোট্ট একটা অংশ। এই ছোট্ট টুকরাটির আর কিছুতেই দখল নিতে পারে না সমুদ্র। পরে ভেসে যাওয়া অংশটি আবার দেখা দেয়, তীর থেকে একটু দূরে। যেন সে অপেক্ষায় ওই অংশটুকুর। ঢেউ নিতে পারে না টুকরোটিকে। বড় অংশটি চলে যায় ফ্রেমের বাইরে। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ফ্রেম ফিরে যায় কালোর অন্ধকারে। সৌম্য সঙ্গীতের সুরে শেষ হয় এই টেক।

টেক-২ (১২ মি:): আবারও মেঘলা আকাশ। সমুদ্র তীরে রেইল দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত হাঁটার পথ। সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়, তবে আগের টেকের মতো প্রবল নয় তা। ডান থেকে বাঁয়ে, এবং বাঁ থেকে ডানে হেঁটে যায় নারী এবং পুরুষরা। নানা গতির হাঁটা, নানা ভঙ্গিও হাঁটা। কেউ সমুদ্রকে দেখে না মনোযোগ দিয়ে। কেউ থামে না। মানুষেরা হেঁটে যায়, সাথে সাথে চলে তাদের ছায়া। একজন হঠাৎ ক্যামেরার দিকে তাকায়। দুই দিক থেকে দুই জোড়া মানুষ এসে ফ্রেমের মধ্যে থামে। তারা কথা বলে। তারা আবার চলে যায়। কবুতরের আবির্ভাব হয়। তারাও চলে যায় এক সময়। যেন সমুদ্রের যে চিরকালীনতা তাতে সমর্পিত হতে রাজি নয় কেউ। এবার ফ্রেম সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যায়। আবারও সৌম্য সঙ্গীতে শেষ হয় টেক।

---

[9] http://www.sensesofcinema.com/2003/abbas-kiarostami/ten

[10] http://www.wordpress.org/Europe/808.cfm

টেক-৩: (১৯ মি:): সাদা ফ্রেমের মধ্যে যে দৃশ্য ক্রমশ ফুটে ওঠে তাতে তিনটি সমান্তরাল ভাগ। মাঝখানের অংশটি সমুদ্র। এটি আকারে সবচেয়ে বড়ো। ওপরের আকাশ তার চেয়ে ছোট। সবচেয়ে ছোট নিচের তীরভুমি। সেখানে সম্ভবত কয়েকটি কুকুর শুয়ে বসে আছে। খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না। সমুদ্রের শব্দ এখানে আগের টেকের চেয়ে নিচু। সময় যত গড়ায় তত আকাশ এবং সমুদ্র সাদা হয়ে একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে যায়।কেবল ঢেউ-এর দোলা ছাড়া সমুদ্রকে আকাশ থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না। একেবারে তীরের কাছে নীলচে রং-এর পাতলা ঢেউ এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে এবং কখনও দুদিকেই খেলতে থাকে।কুকুরের উঠে দাঁড়ায় এবং বাঁ দিকে হেঁটে যায়। আবার তারা বসে পড়ে। এবার তাদেও কুকুর বলে নিশ্চিত চেনা যায়। ক্রমশ তীরভূমিও সাদা হয়ে যেতে শুরু করে। এক সময় আকার, সমুদ্র আর তীর বলে কিছু আর থাকে না। সাউন্ড ট্র্যাকের এবারের সুর আরো সমাহিত, গম্ভীর, মগ্ন।

টেক-৪ (৮ মি:): কম্পোজিশন আগের টেকের মতোই। কিন্তু রঙের গভীরতা বেশি। আকাশ আরো গাঢ় নীলচে। সমুদ্র নীল-সবুজের গাঢ় মিশেল, তীর গভীর সবুজ। সমুদ্র শান্ত। তার গর্জন মৃদু। ফ্রেমের বাম থেকে ডানে হাঁসের মিছিল। সারি বেঁধে একটি একটি করে হাঁস ফ্রেম পার হয়ে যায়। তাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যায় সমুদ্রের মৃদু গর্জনের সাথে মিলে। শেষ দুটি হাঁস ফ্রেমের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু বোঝার চেষ্টা করে। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে দল বেঁধে হাঁসেরা আসতে শুরু করে। এবার আর একটি একটি করে নয়। অনেকে এক সাথে তারা আসতে থাকে এবং দ্রুত ফ্রেম পার হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যেও কোথায় যেন একটা শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তারা থামে না। একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। তারা যেন কোথায় চলেছে, তাদের খুব তাড়া। শেষ হাঁসটি ফ্রেম পার হয়ে গেলে যে সঙ্গীতের আবির্ভাব ঘটে তা শ্রবণে আনন্দময় ঠেকে। সব ছবি কালো হয়ে যায়।

টেক-৫ (২৮ মি:): সাদা কালো টেকটির শুরু কালোর ভেতর থেকে। কুকুর, ঝিঁঝিঁ পোকা, ব্যাঙ, হাঁস, নাম না জানা পাখিরা ডেকে চলে অন্ধকারের ভেতর। একসময় চাঁদ ওঠে। পূর্ণিমার চাঁদ। অবশ্য তাকে দেখা যায় জলের প্রতিফলন হিসেবে। কেননা, ক্যামেরার দৃষ্টি জলে নিবদ্ধ। জলের মধ্যে চাঁদ আকার বদলায়, কাঁপে, স্থির হয়, যেন বয়ে যেতে চায় হঠাৎ। আবার ফিরে আসে নিকষ অন্ধকার। তারপর আবার চাঁদ, অথবা জলে চাঁদেও প্রতিবিম্ব। এই খেলা চলতে থাকে। মেঘের গর্জন এবং বজ্রের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায় বৃষ্টি নামে। অন্ধকাওে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়। তার আলোতে দেখা যায় জলের ওপর বৃষ্টির প্রপাত। আবার অন্ধকার। তারপর বৃষ্টি থামে। আবার চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যায় জলে। ক্রমশ নানারকম প্রাণিদের ডাক স্তিমিত হয়ে আসে। মোরগ ডেকে ওঠে। যেন ভোর হয়। দিনে পবিত্র আলোয় শান্ত জলের খেলা। তারপর অন্ধকারে শেষ নিমজ্জন।

ফাইভ প্রসঙ্গে কিয়ারোস্তামির নিজে বলেছেন সাধারণত চলচ্চিত্র নির্মাণ এক দাবা খেলার মতো ব্যাপার। সেখানে বুদ্ধির খেলাটাই প্রধান। কিন্তু ডিজিটাল সিনেমা তার সাথে যেন জুড়ে দেয় ভাগ্যের ব্যাপারটি। তিনি একে তুলনা করেছেন প্রাচীন বোর্ডগেম ব্যাকগ্যামনের সাথে, যেখানে বুদ্ধিও ব্যাপারটা আছে বটে, কিন্তু ভাগ্য একা বড়ো ভূমিকা পালন করে।

ফাইভ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "It is a wonderful use of digital video to meditate on art and life, art and nature, and Yasujiro Ozu—and all the rest of us that he left behind and graciously inspirits still."[11]

শিরিন (২০০৮) সালে নির্মিত ছবি। ছবির পটভূমি নির্মাণ করেছে খসরু ও শিরিন অথবা শিরিন ও ফরহাদের ত্রিভুজ প্রেমের প্রাচীন লৌকিক গল্প। দ্বাদশ শতকের ইরানি কবি নেজামী গনজাভি খসরু ও শিরিন নামে এই কাহিনি নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যকে মোটামুটি অনুসরণ করেছেন কিয়ারোস্তামি। কিন্তু প্রচলিত চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে নয়। আসলে এমন কোনো ইমেজই তিনি নির্মাণ করেন নি যা ওই কাব্য বা খসরু, ফরহাদ আর শিরিনের গল্পটিকে সিনেমা হিসেবে উপস্থাপন করবে। ইমেজ হিসেবে আমরা কেবল পাই অনেক কয়জন দর্শকের ক্লোজ আপ শট। তাদের বেশির ভাগই নারী। যেন তারা একটি প্রেক্ষাগৃহে বসে একটি চলচ্চিত্র দেখছেন। ধরে নিতে হবে যে ছবিটি দেখছেন তারা সেটিই হচ্ছে শিরিন। সাউন্ড ট্র্যাকে সেই চলচ্চিত্রটির সংলাপ এবং তার গল্প-পৃথিবীর সুর, সঙ্গীত তারা যেমন শুনছেন তেমনি শুনি আমরাও–যাদের কিয়ারোস্তামি *শিরিন* ছবিটি দেখতে ডেকে এনেছেন। আসলে কিয়ারোস্তামি *শিরিন* ছবিটি নির্মাণই করেন নি–এরকমও বলা যায়! অথবা চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ নিয়ে এ এক নতুন খেলা বা নিরীক্ষা তাঁর। আমরা দেখি একশ চৌদ্দজন ইরানি অভিনেত্রী এবং তাদের সাথে ফরাসি অভিনেত্রী জুলিয়েত বিনোশেকে। আরো

[11]Dennis Grunes, Five Long Takes Dedicated to Yasujiro Ozu (Abbas Karostami, 2003), https://grunes.wordpress.com

দেখা যায় কয়েকজন পুরুষকে। তাদের ভেতর আমরা কেবল টেস্ট অব চেরির মূল চরিত্রের অভিনেতাকে চিনতে পারি। এরা সকলে দেখছেন না-হওয়া ছবি *শিরিন*, একটি প্রেক্ষাগৃহে। জানা যায়, আসলে প্রেক্ষাগৃহে নয়, কিয়ারোস্তামির বাড়ির বসার ঘরে এই শটগুলো নেওয়া হয়েছিল। দর্শকেরা, আসলে মূলত মহিলা দর্শকেরাই, ছবির সাউন্ড ট্র্যাকের সাথে সাথে নানা প্রতিক্রিয়া করেন; তারা মৃদু হাসেন, বিচলিত বোধ করেন, আতঙ্কিত হন, আবেগে কেঁপে ওঠেন এবং কাঁদেন। তারা কথা বলেন না বা কোনো অভিব্যক্তি বিনিময় করেন না। যেন প্রেক্ষাগৃহ ভরা মানুষের মধ্যে তারা প্রত্যেকে একা এবং বিচ্ছিন্ন। আর আমরা আরেক স্তরের দর্শক হিসেবে কখনও তাদেও অভিব্যক্তিতে মনোযোগী হই, কখনও সাউন্ড ট্র্যাকে। এভাবে আমাদের মধ্যে *শিরিন* ছবিটি জন্ম নিতে থাকে। সেখানে শিরিন এবং তার প্রেমিক পুরষেরা যেমন থাকে তেমনি চরিত্র হয়ে ওঠে এইসব দর্শকেরাও তাদেও অভিব্যক্তিগুলি নিয়ে। আমরা মধ্যযুগের মধ্য-এশিয়ার ল্যান্ডস্কেপ নির্মাণ করি আজকের ইরানি নারীদের আবেগ-ঘন অভিব্যক্তিতে চোখ রেখে।

চলচ্চিত্র-আলোচক মেহেরনাজ সাঈদ ভাফা বলছেন, "In Five, Kiarostami shoots landscape; here he shoots women's faces as if they were landscape.[12]"।

নারেটিভ চলচ্চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষার পাশাপাশি *শিরিন* কাজ করে সমকালীন জীবন-চিন্তা নিয়ে। শিরিনের জীবনের ট্র্যাজেডিকে আজকের নারী-জীবনের সমান্তরালে স্থাপন করার একটি প্রক্রিয়া ক্রমাগতই চলতে থাকে এই ছবিতে। ছবির শেষে, যে ছবিটি দেখছেন আমরা যে ছবিটি দেখি সে ছবি চরিত্ররা, শিরিন প্রশ্ন করে, কেন কাঁদছেন দর্শকরা। সে কি তার জন্যে না কি তাদের নিজেদের জন্যেই, তাদের প্রত্যেকের অন্তর্জাত শিরিনের জন্যে, সমকালের এবং সভ্যতার সমবয়সী নারী-জীবনের ট্র্যাজেডির জন্যে।

এই শতকের গোড়া থেকে ডিজিটাল সিনেমা চলচ্চিত্রের মূল ধারার মধ্যে ক্রমশ তার নিজের স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রাঙ্গনে ডিজিটাল সিনেমার কর্মস্রোত দুটি বিপরীত প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। ২০০২ সালে কিয়ারোস্তামি যখন নির্মাণ করছেন *টেন* তখন আলেক্সান্ডার সুকোরভ নির্মাণ করেছিলেন *রাশান আর্ক*। দুটিই ডিজিটাল মাধ্যমের ছবি।*টেন* ডিজিটাল প্রযুক্তির সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল যেগুলি স্বল্প আয়োজনে একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণকে সম্ভব করে তোলে। আর *রাশান আর্ক* প্রযুক্তির সর্বশেষ উদ্ভাবনকে ব্যবহার করেছিল বিরাট সমারোহের এক নিরীক্ষার জন্যে। এই দুই বিপরীত প্রবণতা চলচ্চিত্রে আপাতত স্থায়ী আসন নিয়েছে। একদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোশন ক্যাপচার, সিমুলেটেড ল্যান্ডস্কেপ এমনি সব চোখ ধাঁধাঁনো ঘটনা, আর উল্টো দিকে স্বাধীন ব্যক্তিগত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা। একদিকে বাণিজ্যের নিত্য নতুন উপাদানের সন্ধান, অন্যদিকে শৈল্পিক নিরীক্ষা, চলচ্চিত্রকারের মুক্তি। ডিজিটাল সিনেমা এভাবে এক ক্রসরোডে এসে দাঁড়িয়েছে। আব্বাস কিয়ারোস্তামি এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছিলেন। অন্তত *টেন*,*এ বি সি আফ্রিকা* বা *শিরিন*-এর মতো ছবি তার শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে রয়ে গেছে। তিনি নতুন সিনেমায় ফিরেছেন–বারবার। কিন্তু সে ফেরা শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ এবং তাঁর শিল্পের দায় মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক সংবেদের প্রতি।

এই মহান চলচ্চিত্রনির্মাতাকে অশেষ শ্রদ্ধ জানাই।

[12] http://www.jonathanrosenbaum.net/2015/12/17173/